

# কে হয় হৃদয় খুঁড়ে

## ভজন সরকার

(১৫)

একটি দীর্ঘ সরলরেখায় আঁকা প্রায় শ'খানেক বাড়ি নিয়ে আমাদের গ্রামখানি । পশ্চিম পাড়া, মধ্যপাড়া আর পূর্বপাড়া । যদিও মাঝখানে নেই কোন ব্যবচ্ছেদ রেখা । শুধু মাত্র গোটা কতক বাড়ির পর একটু ফাঁকা জমি । প্রায় মাঠের সমান উচ্চতা । এই নালায় মতো জমিকে সবাই বলে ‘জোলা’ । বর্ষাকালের প্রায় মাস চারেক এই জোলায় উপর পাতা থাকে বাঁশের সাঁকো । আঁড়া আড়ি করে পোঁতা বাঁশের চিপার মধ্যে সমান্তরাল করে একটি মোটা বংশ দন্ড । আর হাতের নাগাল উচ্চতায় আরেকটি চিকন বাঁশের ফালি । এই হলো পাড়ায় পাড়ায় সংযোগ স্থাপনকারী পুলের স্থাপত্য । গ্রামের শেষ দু’প্রান্তের দু’বাড়ির প্রায় মাইলখানেক দূরত্বকে সহজেই বেঁধে ফেলা হয়েছে প্রায় ডজনখানেক সংযোগ পুল দিয়ে । আর এ সমস্ত বাঁশের পুলের মাধ্যমেই পুরো গ্রামখানি একটি সূতোয় বাধায় । এ যেনো বর্ষাকালে কর্মহীন গৃহস্থের পাড়া বেড়ানোর মাধ্যম ।

পূর্ব পাড়ার শেষ তিনটি বাড়ি । বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে , এই বাড়ি ক’টি এ গ্রামের অন্তর্ভুক্ত নয় । মাঝখানের জোলায় প্রস্থও তেমন বিস্তৃত নয় । শুধুমাত্র একটি উঁচু ভিটার মতো জায়গা ছাড়া । বর্ষাকালে যদিও তা খই খই জলের ভিতর ডুবে থাকে আর সমস্ত জমিনের মতোই । জল নামলেই কেবল বুঝা যায় এই উঁচু ভিটার উপর আরো কিছু উঁচু জায়গা আছে । তাতে কাতিরক মাস শেষ হলেই বসানো হয় কালির মূর্তি । অথর্থা পুরোগ্রামের দু’টি কালি বাড়ির এটি একটি । এই কালি বাড়ির গা ঘেষেই নেমে গেছে একটি ছোট জলের ডোবা । তার অপর পাড়েই গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন এই তিনটি বাড়ি । মুসলমান বাড়ি । তাই পাশা পাশি অবস্থান করলেও তার নাম-ঠিকানা আমাদের গ্রাম থেকে পৃথক । এটি অন্যগ্রাম-অন্য নাম । যা যুক্ত প্রায় আরো মাইল খানেক দূরত্বের আরেকটি গ্রামের সাথে । যদিও আমাদের পশ্চিম পাশের কয়েক হাজার জনবসতি অধ্যুসিত গ্রামে হিন্দু-মুসলমান দু’ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষই বাস করে । তবে কেন এই বিভাজন ? ছোট বেলায় গ্রামের অনেক বয়স্ক লোকদের জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাওয়া যেতো নানা রকমের । তবে প্রায় সবাই যে উপসংহারটি টানতো তা উগ্র ধর্মীয় সম্প্রদায়িক । সব শেষে পরম নিশ্চয়তা আর ভরসার কথা । মাঝখানের এই কালি ভিটেটি আছে বলেই গ্রামটি পবিত্র আর পরম শান্তিতে আছে এই তিন ঘর “ নেড়ে-যবন ” থেকে । হিন্দুদের যেমন প্রায় প্রকাশ্যেই “ মালাউন ” বলা হতো । মুসলিমদেরও তেমনি আড়ালে আবড়ালে “ নেড়ে -যবন ” নামেই ডাকতো অনেক হিন্দুরা ।

আর কালি-মাতা গ্রামকে পবিত্র আর রক্ষা করছে এটা বিশ্বাস করলেও , কালি মাতার যে নিজের নিষ্কৃতি নেই এই তথাকথিত নেড়ে-যবনের হাত থেকে । সেটা বুঝা যেতো পূজা সম্পন্ন হবার পরের রাতেই । কারণ, পূজোর পরের রাতেই দেখা যেতো কালি-মাতার মুণ্ডো নেই কিংবা হস্ত নেই । অথবা সমস্ত শক্তির আরাধ্য দেবী উপড়ু কিংবা চিৎ হয়ে পড়ে আছে । পরের দিন সকালে যখন সবাই এ নিয়ে বচসা করছে ,সেই বালক বয়সেই আমার কেমন জানি সন্দেহ হতো দেব-দেবীর এই তথাকথিত শক্তি নিয়ে । মাকে প্রশ্ন করতাম, কালি-মাতা যখন আক্রান্ত হোলো তখন সে নিজে প্রতিরোধ করলো না কেনো? আজীবন অলৌকিক ধর্মীয় সংস্কৃতি আর বিশ্বাসের প্রতি অশিষ্ট আমার মা আমার প্রশ্ন শুনে হাসতো । আর সহজ উত্তরে বুঝাতো, অনেক সময় অশুভ শক্তির কাছে শক্তিমানও পরাজিত হয় ।

তাই বলে প্রতি বৎসর-প্রতিবার ? আরেকটু বড় হলে মা আমাদের শেখাতো, আসলে সবধর্মই মানুষের সৃষ্টি, মানুষকে সহজভাবে একত্র করার একটা উপায় । আর শরৎ চন্দ্রের উপন্যাসের মতো ধর্মীয় গ্রন্থগুলোও এক ধরনের উপদেশমূলক গ্রন্থ । কালি কিংবা দুর্গা সেই সমস্ত গ্রন্থেরই এক একটি প্রধান চরিত্র । একজন প্রাইমারী ইস্কুলের শিক্ষিকার কাছ থেকে শেখা এই কথাগুলো পরবর্তীতে আর কারো কাছ থেকে শুনেছি কি? হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন বিদগ্ধ তথাকথিত নাস্তিক ছাড়া আর কারো কথা মনে পড়ছে না । আমার মায়ের পরম সৌভাগ্য, ফতোয়াবাজদের কাছ থেকে নাস্তিকতার অপরাধে দণ্ডিতা হবার আগেই শিক্ষকতা থেকে সসম্মানে অবসর নিয়ে দেশ ত্যাগ করতে পেরেছেন ।

পাশা পাশি অবস্থানের জন্যেই কিনা জানিনা, এই তিন ঘর “নেড়ে -যবন ” - সংশ্লিষ্ট গ্রামটির সাথে আমাদের গ্রামের একটি মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের সম্পর্ক ছিলো । তা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক -যে কোন দিকেই হোক না কেনো । যেমন স্বাধীনতার সময়ে শুধুমাত্র এই মুসলমান গ্রামটি রাজাকার-আলবদরে ভরা ছিলো । যদিও আর সমস্ত গ্রামগুলো হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধ-কে সমর্থন করতো । স্বাধীনতার পরেও পুরোগ্রামটিতে হ্যারিকেন নিয়ে খুঁজলেও বামপন্থি দূরে থাক , একজন আওয়ামী লিগের সমর্থকও পাওয়া যেতো না । সবাই মুসলিম লীগার । আর পরবর্তীতে মুসলিম লীগের নতুন সংস্করণ জামাত কিংবা বি এন পি । অথচ আশে পাশের অন্য গ্রামগুলোতে ন্যাপ-কমিউনিষ্ট কিংবা আওয়ামী লীগের ঘাঁটি ছিলো । এমন কি মুসলমানদের মধ্যেও ।

নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেমন যাত্রা-থিয়েটার সহ নানাবিধ খেলাধুলা আমাদের এলাকার একটি প্রধান ঐতিহ্য থাকলেও এই গ্রামটিতে তা এক প্রকার নিষিদ্ধই ছিলো । যদিও আমাদের এক বন্ধু ইসমাইল আমাদের গ্রামে যে রাতে থিয়েটার হতো, সে রাতে ওর নানা বাড়ি থাকতো । যা ছিলো আমাদেরই দক্ষিণ দিকের আরেকটি মুসলমান প্রধান গ্রাম । আর ইস্কুল থেকে সন্ধ্যার আগে ফিরেই আমাদের গ্রামে চলে আসতো ইসমাইল থিয়েটারের মঞ্চ সাজানোর কাজে হাত লাগাতে । সদ্য-প্রয়াত নাট্যকার সেলিম আল দীনের শ্বশুর-বাড়ি যে গ্রামে, তালুকনগর- সেটাতো আমাদের প্রতিবেশী আর একটি মুসলমান প্রধান গ্রাম । এক শীতের রাতে সেখানেই মঞ্চস্থ হয়েছিলো তাঁরই নিজ হাতে গড়া গ্রাম থিয়েটারের নাটক “ বাসন ” । কেন কি কারণে মনে নেই, আমি যেতে পারি নি সেই গ্রাম থিয়েটারের “ বাসন ” দেখতে । যদিও পরবর্তীতে সেলিম আল দীনের একটি বইয়ের নামেই অভিভূত হয়ে থেকেছি কিংবা থাকি এখনো । যখনই চাল চড়িয়ে দেই উনুনে - “ চাল ধোয়া স্নিগ্ধ হাত চাই ” । এমন ব্যঞ্জনাময় , এমন প্রগতিশীল প্রতিকী শব্দময় বাক্য বাংলাসাহিত্যে আর কয়টি আছে ? কী অর্থে - কী আকাংখায় !

স্বাধীনতার বেশ পরে বিশেষ করে যখন পচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো । আন্তে আন্তে পরিবর্তনের হাওয়া লাগলো সারাদেশে । ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক যে গোষ্ঠিটি এতদিন চূপ করেছিলো । তারাই রাষ্ট্রীয় মদদে অনুকূল সময় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে আরম্ভ করলো । আগে যারা রাতের অন্ধকারে কালির মুন্ডপাত ঘটাতো । ক্রমশঃ তারা প্রকাশ হোতে শুরু করলো । নিতান্ত সাধারণ ঘটনা সহজেই সাম্প্রদায়িক রেষারেষিতে রূপ নেয়া শুরু করে দিলো । স্বাভাবিকভাবেই তার প্রথম সূত্রপাত ঘটলো আমাদের পাশের এই গ্রামটিতে । অঘোষিত রক্তপাতহীন এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শো-ডাউনের মধ্যে দিয়ে ।

(চলবে )

।। এপ্রিল ০৩, ২০০৮ । নায়েগ্রা ফলস, কানাডা ।।